৫. সামন্ততন্ত্রের মূল বৈশিষ্ট্যগুলি কী? প্রাচীন ভারতে সামন্ততন্ত্রের উদ্ভব হয়েছিল কি না যুক্তিসহ লেখো।
(ক. বি. ২০০১/২০০৫)

খ্রিস্টিয় ষষ্ঠ শতকে রোম সাম্রাজ্যের অবসান ঘটার পরবর্তী সময়ে পশ্চিম ইউরোপে নতুন এক ধরনের সামাজিক সম্পর্ক এবং রাষ্ট্রীয় প্রশাসন রীতি গড়ে উঠেছিল। ধীরে ধীরে বিকশিত হওয়া এই নতুন ধারাকে বলা হয় 'সামন্ততন্ত্র' বা 'Feudalism'। এই নতুন সামন্ততন্ত্রের প্রধান নিয়ন্ত্রক ছিলেন সামন্তপ্রভু নামে এক শ্রেণির অভিজাত সম্প্রদায়। এরা ছিলেন ব্যাপক পরিমাণ জমির মালিক ও ভূমিরাজস্বের অধিকারী। এদের বিশাল সৈন্যবল এবং অর্থবল ছিল। আবার এই কারণে রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থায় এরা খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতেন। ধীরে ধীরে রাজতন্ত্র আরও শক্তিশালী হলে সামন্তপ্রভুদের ক্ষমতা কমে তখন সামন্তপ্রভুরা রাজাকে তাদের নেতা বলে মেনে নিয়ে সম্পত্তি এবং প্রশাসনিক ক্ষমতা ভোগ করেন। আবার সামন্ততান্ত্রিক এই ব্যবস্থা ছিল বংশানুক্রমিক।

বৈশিষ্ট্য: সামন্ততন্ত্রের ধরন নানা দেশে নানারকম ছিল। তবে এদের কতগুলি সাধারণ বা বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল। এগুলি নীচে আলোচনা করা হলো—

(ক) **স্বৈরতন্ত্রের বিন্যাস তথা ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ:** সামন্ততন্ত্রের যথাযথ বিন্যাসকে লক্ষ করলে এর মধ্যে এক স্তরবিন্যাস দেখা যায়। সামন্ততন্ত্রের সবচেয়ে উঁচুতে ছিলেন রাজা। তিনি ছিলেন দেশের সব জমির মালিক ও সব ক্ষমতার উৎস। যেহেতু রাজার একার পক্ষে রাজ্যের সব জমি চাষ করা বা রাজনৈতিক এবং প্রশাসনিক কর্তব্য পালন করা সম্ভব নয়, তাই তিনি বেশ কিছু সামন্ত বা ডিউক এবং আর্ল এদের মধ্যে সব জমি ও রাজনৈতিক এবং

Scanned with CamScanner

প্রশাসনিক ক্ষমতা ভাগ করে দেন। এ ক্ষেত্রে এঁরা ছিলেন সামন্ত বা ভেসাল ও রাজা ছিলেন সামন্তপ্রভু বা লর্ড। আবার আরও ছোট সামন্ত অথবা, ব্যারনদের মধ্যে জমি এবং ক্ষমতা ভাগ করে দেন। এ ক্ষেত্রে ব্যারনরা হলো আর্ল ও ডিউকের সামন্ত ও আর্লরা হলেন সামন্তপ্রভু। ব্যারনরা আবার একই পদ্ধতিতে জমি এবং ক্ষমতা নাইটদের মধ্যে ভাগ করেছেন। নাইটরা হলেন সামন্তপ্রভুদের সবচেয়ে নীচের স্তর। অতএব এখানে একটা কথা উল্লেখ্য যে ডিউক, আর্ল ও ব্যারনরা হলেন একদিকে সামন্তপ্রভু ও অন্যদিকে প্রজা বা ভেসাল। আবার এদের সবার আনুগত্য ছিল রাজার কাছে। এই পদ্ধতি চলার ফলে ইউরোপে মধ্যযুগে অনেক ছোট ছোট স্বাধীন ও অর্ধ স্বাধীন রাজ্য তৈরি হয়। যার ফলে কেন্দ্রীয় সরকার দুর্বল হয়ে গিয়েছিল।

(খ) **পারস্পরিক বন্ধন:** ভূমিকে কেন্দ্র করে তৈরি হওয়া এই ব্যবস্থায় সামন্তপ্রভু এবং প্রজাদের বা ভেসাল-এর মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়া, বিশ্বাস ও আনুগত্যের বন্ধন ছিল। তারা উভয়েই নিজের নিজের দায়িত্ব পালন করত।

(গ) **ভূমিদাস:** রাজা, ডিউক, আর্ল, ব্যারন, নাইটরা কেউই তাদের নিজেদের জমি চাষ করত না। জমিতে চাষাবাদ করত এদের অধীনের ভূমিদাসরা। এদের জীবন ছিল দুঃখ, দুর্দশাতে ভরা। ক্রীতদাসদের থেকেও করুণ। কারণ ক্রীতদাসদের বিক্রি করা যেত বা মুক্তিও দেওয়া যেত কিন্তু, সার্ফদের জমি থেকে পৃথক করা যেত না। জমি বিক্রি হলে জমিদাসরাও তার সাথে বিক্রি হয়ে যেত।

(ঘ) **অন্যান্য বৈশিষ্ট্য:** এই সময়ে কৃষিব্যবস্থার উপর বেশি গুরুত্ব দেওয়ায় শিল্প এবং বাণিজ্যের অবনতি হয়। গ্রামভিত্তিক অর্থনীতি তৈরি হয়।

(ঙ) **মুদ্রার স্বল্পতা:** সামন্ততন্ত্র বিন্যাসের অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য হলো মুদ্রার স্বল্পতা।

(চ) **আঞ্চলিকতার বিকাশ:** সামন্ততন্ত্রের প্রভাবে আঞ্চলিকতার বিকাশ হয়।

ভারতে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা: ইউরোপে সামন্ততন্ত্রের এই বৈশিষ্ট্যকে লক্ষ করে কোনও কোনও ভারতের ঐতিহাসিক ৩০০–১২০০ খ্রিস্টাব্দের মাঝের সময়ে ভারতে সামন্ততন্ত্রের উদ্ভব, বিকাশ ও অবক্ষয় লক্ষ করেছেন। তারা ভারত ও ইউরোপের মধ্যে মিলও খুঁজে পেয়েছেন। এই সম্পর্কিত তথ্য প্রথম উত্থাপন করেন ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত। এর পরবর্তী সময় দামোদর ধর্মানন্দ কোসাম্বি ও মার্কসবাদী নেতা এস. এ. ডাঙ্গে এ সম্পর্কে মতামত প্রকাশ করেছেন।

পক্ষে যুক্তি: রামশরণ শর্মা ৩০০–১২০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়কে সামন্ততন্ত্রের বিকাশ, উন্মেষ এবং অবক্ষয়ের যুগ বলে দেখিয়েছেন। তাঁর মতে ৩০০–৬০০

Scanned with CamScanner

খ্রিস্টাব্দ হলো উত্থানের সময়, ৬০০–৯০০ খ্রিস্টাব্দ হলো বিকাশকাল, ৯০০–১২০০ খ্রিস্টাব্দ এই পর্যায়ের চূড়ান্ত বিকাশ এবং অবলুপ্তির সময়। এ ছাড়াও আরও বলেন যে, মৌর্য যুগের পরবর্তী সময় থেকে ভারতে সামন্তব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য সমূহ সুস্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকে। সামন্তদেরও উদ্ভব ঘটে। বলা হয়ে থাকে যে—

(ক) প্রাচীন যুগে ধর্মীয় কারণে ব্রাহ্মণকে জমি দেওয়া বা অগ্রহার ব্যবস্থা থেকেই ভারতে সামন্তব্যবস্থার উদ্ভব ঘটে। এর পর হিন্দু মন্দির, জৈন ও বৌদ্ধ মঠ, ইত্যাদিকে জমি বা গ্রাম দেওয়ার ব্যবস্থা প্রচলিত হয়।

(খ) মৌর্য, কুষাণ, গুপ্ত, হর্ষবর্ধনের সময়ে সরকারি কর্মচারীরা প্রচুর বেতনের বিনিময়ে সমৃদ্ধশালী গ্রাম বা ভূভাগ ভোগ করতেন।

(গ) সামরিক প্রশাসনেও সামন্ততান্ত্রিকতা প্রকট ছিল। যুদ্ধের সময়ে রাজাকে সেনা সরবরাহের শর্তে সামরিক নেতারা জমি ভোগ করতেন। সামরিক ক্ষেত্রে চাহিদা বাড়ায় একাদশ শতাব্দীতে ভূমিদান প্রচুর পরিমাণে বাড়ে।

(ঘ) এ সব ছাড়াও স্থানীয় প্রধান বিভিন্ন উপজাতি ও গোষ্ঠী এই ভূভাগ ভোগ করতেন। এরা আবার নানা স্তরে বিভক্ত ছিল। এ সব শাসকদের পদ ছিল বংশানুক্রমিক। নিজ নিজ এলাকায় তারা শৃঙ্খলা রক্ষা, বিচার করা, কর আদায় করতেন। এ ভাবেও দেশে এক সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা গড়ে ওঠে।

আবার এখানে সমাজের প্রধানরা জমিতে কোনও প্রকার শ্রম না করেও ভূমি থেকে জীবিকা নির্বাহ করতেন। এই প্রথার সময়ে সমাজে মধ্যস্বত্ব ভোগীদের উদ্ভব হয়। যারা রাজা ও কৃষকদের মধ্যবর্তী শ্রেণি অতএব সমাজের তিন শ্রেণি হলো—(i) মহাপতি, (ii) স্বামী এবং (iii) কর্ষক। মহাপতি হলেন রাজা, স্বামী হলেন জমির মালিক এবং কৃষকই হলো কর্ষক।

মৌর্য যুগের শাসনপ্রণালী এককেন্দ্রিক হওয়ার জন্য সেখানে সামন্ততন্ত্র বিকাশের পথ ছিল না। আবার গুপ্ত যুগে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত তাঁর সাম্রাজ্য সামন্তদের দিয়ে শাসন করা বেশি সুবিধাজনক বলে মনে করতেন। তাই তাঁর অধীনে অনেক সামন্ত রাজা ছিলেন। পুষ্যমিত্রর হূণ আক্রমণকালে সামন্তরাজাদের প্রতিপত্তি প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। সাতবাহন, বাকাটক, পাল, প্রতিহার ও রাষ্ট্রকূট রাজাদের এ ধরনের ভূমি ছিল। ফলস্বরূপ রাজকীয় মর্যাদা প্রচুর পরিমাণে কমে যায়। আবার, অন্যদিকে সামন্তদের কর্তৃত্ব বেড়ে যায়। রাজারা সামন্তদের উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল হয়ে পড়েন। ফলে রাজ্যের ভিতরে অনেক ছোট ছোট রাজ্য গড়ে ওঠে।

এই যুগের আর্থিক নীতি কৃষি নির্ভরশীল হওয়ায় আভ্যন্তরীণ ও বহির্বাণিজ্য কমে যায়।

Scanned with CamScanner

বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার ফলাফল স্বরূপ শিল্পের উৎপাদন অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। এর ফলে নগরের ও পতন ঘটে। এ সময় কোসাম্বি, কোপিলার, শ্রাবস্তী, কুশীনগর, রামগ্রাম ইত্যাদি নগরের পতন ঘটে। শর্মা একে বলেছেন 'Urban Anaemia'।

বাণিজ্যের হ্রাস ঘটে ফলে উৎপাদনও বন্ধ হয়ে যায়। এর ফলাফল স্বরূপ অর্থনীতি গ্রামভিত্তিক হয়ে পড়ে। গ্রামীণ অর্থনীতি স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে ওঠে ও মুদ্রা সংকোচন ঘটে।

কৃষকেরা করুণ পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়। কারণ তারা শুধুমাত্র জমিতেই আবদ্ধ হয়ে পড়ে। কৃষকদের পূর্বে বলা হতো 'গৃহপতি', 'কুটুম্বী' ইত্যাদি। কিন্তু পরবর্তী সময় তাদের 'আশ্রিত হালিক', 'বদ্ধ হল' বলা হতো। এই নতুন শব্দগুলি তাদের করুণ অবস্থাকে নির্দেশ করে।

বিপক্ষ যুক্তি: এই মতের বিরোধিতায় বলা হয় যে, ইউরোপীয় সামন্ততন্ত্রের সাথে গুপ্ত যুগের পরবর্তী সময়ের সামাজিক ব্যবস্থায় কিছু মিল থাকলেও উভয়ের মধ্যে অমিলই বেশি। এগুলি হলো—

(ক) প্রাচীন ও মধ্য যুগের ভূমিব্যবস্থাকে সামন্তনীতির সাথে মিশিয়ে দেওয়া ঠিক নয়। বিকেন্দ্রীকৃত নিয়ম মানেই কিন্তু সামন্ততান্ত্রিক প্রথা নয়। আসলে যাকে ভারতীয় সামন্ততন্ত্র বলা হচ্ছে তা হলো চিরাচরিত জমিদারি ব্যবস্থা, রাজা কখনওই ভারতের সমস্ত জমির মালিক ছিলেন না। অন্য দিকে সামন্তপ্রথার প্রাথমিক শর্তই হলো রাজা দেশের সকল জমির মালিক।

(খ) শর্মা ভারতীয় সামন্তপ্রথার সময় নির্ণয় করেছেন ৬০০–১২০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। অন্যদিকে নুরুল হাসানের মতে মুঘল যুগেও এর অস্তিত্ব ছিল।

(গ) দীনেশচন্দ্র সরকার এই সময়ের তাম্রলিপিগুলি পরীক্ষা করে দেখেছেন যে, অগ্রহার ব্যবস্থা দ্বারা রাজার কর্তৃত্ব কমে যায়নি বা তাঁর অর্থনৈতিক অবস্থাও হীনবল হয়নি। বিভিন্ন লিপি থেকে জানা যায়, এ ধরনের জমিগুলি থেকে মোটামুটি ভাবে দান গ্রহীতারাই রাজস্ব কর আদায় করতেন। ইচ্ছা অনুসারে আদেশনামা জারি করে এ সব জমি থেকে কর আদায় করতে পারতেন ও রাজদ্রোহিতার জন্য দান গ্রহীতাকে জমি থেকে বিতাড়িত করতে পারতেন।

(ঘ) ভারতীয় কৃষকদের ইউরোপিয়ান ভূমিদাসদের সাথে তুলনা করা কখনওই উচিত নয়। তাদের অবস্থা কখনওই এমন শোচনীয় জায়গায় পৌঁছায়নি। হরনন্স মুখিয়ার মতে, সেই সময় ভারতীয় উৎপাদনের উপকরণের উপর কৃষকদের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ছিল। তাই তিনি এই উৎপাদন ব্যবস্থাকে সামন্ততন্ত্র

Scanned with CamScanner

বলতে নারাজ ছিলেন। এ সময় কৃষকের সাথে জমির অচ্ছেদ্য বন্ধনও ছিল না। পুরাণে তাদের সম্পর্কে 'বদ্ধ হল', 'আশ্রিত হালিক' শব্দ ব্যবহৃত হলেও এই কথাগুলি ভূমিদাসের সদর্থক ছিল তা পুরাণে নেই। তাই একথা বলা কঠিন এই সময় ভারতীয় কৃষকদের অর্থনৈতিক অবস্থা ভূমিদাসদের স্তরে পৌঁছেছিল।

(ঙ) শর্মা ও তাঁর অনুগামীরা এ সময়ে বাণিজ্য হ্রাসের যে কথা বলেছেন তা ঠিক নয়। এই সময় রোম-ভারত বাণিজ্যতে মন্দা দেখা দিলেও সামগ্রিক ভাবে সারা ভারতের বাণিজ্য হ্রাস পায়নি—(i) এই সময় পশ্চিম ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার নানা দেশের সাথে ভারতের বাণিজ্য কেন্দ্রিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে; (ii) সেই সময়ের লিপিগুলিতে অজস্র বার মন্ডপিকা (উত্তর ভারতের বাজার), নগরম (দক্ষিণ ভারতের বাজার) ও শ্রেষ্ঠ, কুলিক, নিবাস বা বণিক সংঘের উল্লেখ বাণিজ্যের উৎকৃষ্টতার চিত্রই বহন করে।

(চ) রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের মতে, মুদ্রা হ্রাসের যুক্তিও সমর্থন করা যায় না। সপ্তম থেকে ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত দক্ষিণ পূর্ব বাংলার রৌপ্য মুদ্রা বাণিজ্যের গতিশীলতারই নিদর্শন। এ সময় উত্তর ও পশ্চিমবঙ্গে সেন এবং পাল যুগের কোনও মুদ্রা পাওয়া যায়নি তবে কড়ি ব্যবহারের প্রমাণ পাওয়া যায়। এগুলি যাই হোক নিশ্চয় আবদ্ধ অর্থনীতির সাক্ষ্য প্রমাণ করে না।

(ছ) শর্মা ও তার অনুগামীরা কোনও পরীক্ষার ভিত্তিতে আদি মধ্যযুগে নগর অবক্ষয়ের চিত্র তুলে ধরেন। তেমনই ব্রজদুলাল চট্টোপাধ্যায় প্রমাণ করে দিয়েছেন যে, ওই যুগের বহু নগর তাদের সমৃদ্ধির শিখরে ছিল। উত্তরপ্রদেশের অহিছত্র, রাজঘাট, বিহারের চিরান্দ ইত্যাদি নগর তাদের ধারাবহিক অস্তিত্ব বজায় রাখে। চট্টোপাধ্যায় এই পর্বের নগরায়ণকে তৃতীয় দফা নগরায়ণ বলেছেন।

আদি মধ্যযুগে ভারতে সামন্ততন্ত্রের অস্তিত্ব এক বিতর্কিত অধ্যায়। এই সম্পর্কে নানা প্রশ্ন উঠছে। আসলে পশ্চিম ইউরোপের ধরনে ভারতে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার অস্তিত্ব প্রমাণ করা অসম্ভব। ব্যাসার্থ এ যুগের ভারতীয় অবস্থাকে 'আধা সামন্ততান্ত্রিক' বা 'সামন্ততান্ত্রিক ধাঁচের' চেয়ে বেশি কিছু বলতে চান না।

Scanned with CamScanner